‘গণতন্ত্রের মানসকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পঁচিশ বছর গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম ও সাফল্য’

নূহ-উল-আলম লেনিন

১৭ মে, ২০০৬ জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত।

প্রথম মুদ্রণ: ১৭ মে, ২০০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ: ২৭ মে, ২০০৬

মূল্য: তিন টাকা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তথ্য ও গবেষণা বিভাগের প্রকাশনা
২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত

১৯৮১ সালের ১৭ মে। মেঘ মেদুর– সে দিনটি ছিল বর্ষণ ক্লান্ত। লক্ষ কোটি বাঙালির উন্মাতাল ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে স্বদেশের পবিত্র মাটিতে পা রেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে শোকস্তব্ধ বাক্যহারা অযুত মানুষ সেদিন প্রকৃতির মতোই অঝোর ধারায় মর্মভেদী কান্নায়– আনন্দাশ্রুতে বরণ করে নিয়েছিল তাঁকে। ভগ্নহৃদয়-শোকাহত-আশাহত-দিশাহীন বাঙালি জাতি সেদিন শেখ হাসিনাকে তাদের মধ্যে ফিরে পেয়ে জেগে উঠেছিল নতুন আশায়, নতুন স্বপ্নে ও উদ্দীপনায়।

দেখতে দেখতে ইতোমধ্যে পঁচিশটি বছর পেরিয়ে গেল। এই সিকি শতাব্দীতে মানুষের সেই স্বপ্ন-আশা পূরণ করতে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে কতটা পথ পেরুতে হয়েছে, কী দুঃসাধ্য সাধন করতে হয়েছে, কী বিপুল প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং অলৌকিকভাবে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসে জীবনজয়ের যুদ্ধে ব্যাপৃত হতে হয়েছে সে কাহিনী আপনাদের জানা আছে। তবুও আজ আমরা আরেকবার ফিরে তাকাতে চাই জননেত্রী শেখ হাসিনার এই সিকি শতাব্দীর পথ-পরিক্রমার সংগ্রামমুখর দিনগুলোর দিকে। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পঁচিশ বছর পূর্তির এই দিনে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এই অকুতোভয় মহিয়সী নেত্রীর হিরন্ময় অবদানের কথা। কেননা শেখ হাসিনা আজ আর শুধু একজন ব্যক্তি নন, প্রতিষ্ঠানও বটে এবং তিনি কেবল তার স্বামী-পুত্র-কন্যা পরিবারের নন, এমনকি কেবল তাঁর প্রিয় দলের নন– তিনি সমগ্র বাঙালি জাতির অতি আপনার জন।

নীলকণ্ঠ পাখি এক

যে বিষ পান করে বিষ হজম করতে পারে তাকে বলা হয় নীলকণ্ঠ। শেখ হাসিনাকে আমি নীলকণ্ঠ পাখির সঙ্গে তুলনা করব। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ঘটনাক্রমে দেশে না থাকায় অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান। জার্মানিতে অবস্থানকালে তিনি সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার সেই মর্মান্তিক দুঃসহ সংবাদ শুনতে পান। বেঁচে থাকা যে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর, বিষপানের মতো যন্ত্রণাময়– শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার মতো আর কারো পক্ষে তা সমভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এ যেন গ্রিক ট্র্যাজেডির নিয়তি নির্ধারিত খেলা। যে মারা যায়, তার মুহূর্তের মৃত্যু যন্ত্রণা মৃত্যুতেই লীন হয়ে যায়। কিন্তু নিয়তি যেন কাউকে কাউকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখে মৃত্যু-যন্ত্রণার মতোই প্রতি মুহূর্তে পলে পলে স্বজন হারানোর যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য। আর এই যন্ত্রণা ও বেদনার ভারকে বুকে ধারণ করেই গত পঁচিশ বছর ধরে তিনি জাতির জনকের স্বপ্ন রূপায়ণ ও বাংলার দুখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছেন।

মাতৃভূমির ডাক

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রক্তাক্ত ঘটনাবলির পর তাৎক্ষণিকভাবে স্বদেশে ফেরার কোনো পরিবেশ ছিল না। মাতৃভূমি বাংলাদেশে তখন চলছে ক্যু পাল্টা ক্যু। ক্ষমতার বখরা নিয়ে চলছিল হিংস্র শকুনিদের টানাহেঁচড়া। জেনারেল জিয়ার বর্বর সামরিক জান্তার বুটের তলায় পিষ্ট হচ্ছিল পবিত্র সংবিধান, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার। পেছনে তাড়া করে ফেরে মৃত্যুর বিভীষিকা। বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ। সামরিক জান্তা চায় না বঙ্গবন্ধুর রক্তের

উত্তরাধিকার শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসুক। সৃষ্টি করে নিষেধের বেড়াজাল। দেশের বুকে তারা জন্ম দেয় 'ভয়ের সংস্কৃতি'।

এদিকে দিক-নির্দেশহীন, কাণ্ডারিবিহীন জাতি অতল অন্ধকারের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তার হাতে গড়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগেও চলছে নেতৃত্বের শূন্যতা। গ্রহণযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ওই দুর্দিনেও দলের একাংশ দল থেকে বেরিয়ে পাল্টা সংগঠন করেছে। মূল দলেও চলছে উপদলীয় কোন্দল। লাখ লাখ আওয়ামী লীগ কর্মী হতাশায় মুহ্যমান। অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শিবিরের অন্যান্য দলেও চলছে নানা বিভ্রান্তি। এক ঘোর অমানিশার রাহু যেন সবকিছু গ্রাস করেছে।

¯‡`k cZ¨veZ‡bi gv‡n›` ¶‡Y, 17 †g 1981

এমনি এক দুঃসময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৎকালীন নেতৃবর্গ সর্বসম্মতভাবে জাতিকে নেতৃত্বের শূন্যতা থেকে রক্ষা করার জন্য বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরে এসে দলের দায়িত্বভার গ্রহণের অনুরোধ জানান। স্বভাবতই দেশ মাতৃকার প্রতি কর্তব্যবোধে প্রাণিত শেখ হাসিনা এই অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি। দলের একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসেবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করলেও দল তাঁকে সভাপতির দায়িত্বভার চাপিয়ে দেয়। ১৯৮১ সালের ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। আর ওই বছরেরই ১৭ মে দীর্ঘ ৬ বছরের নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন শেখ হাসিনা।

যুদ্ধজয়ের প্রস্তুতি

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ফলে সমগ্র দেশব্যাপী সৃষ্টি হলো প্রবল আলোড়ন। বদলে গেল দৃশ্যপট। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ঝিমিয়ে-পড়া আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা ফিরে পেল নতুন জীবনের প্রাণস্পন্দন। শেখ হাসিনার অভয়মন্ত্রে ভয়কে জয় করে দেশবাসী এবং নেতা-কর্মীরা সামরিক জান্তা ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে রাজনৈতিক পরিবারে– বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্রে জন্ম হলেও একটি রাজনৈতিক দল পরিচালনার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। ৬-দফা আন্দোলনে, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন এবং অসহযোগ থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু পর্যন্ত প্রতিটি আলোড়নে ছিলেন পিতার প্রায় ছায়াসঙ্গী। কিন্তু নিজেকে কখনো দল ও দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে এ কথা তিনি কস্মিনকালেও ভাবেননি। বস্তুত অপ্রস্তুত অবস্থায়, এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তাঁকে দলের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। এ-ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, নেতৃত্বের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায় তিনি দলের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হননি। বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দলের ঐক্যের প্রতীক রূপে দলের নেতা-কর্মীরা তাকে বরণ করে নিয়েছে। বিষয়টি ছিল তার কাছে এক চ্যালেঞ্জের মতো।

বাস্তবতার এই উপলব্ধি থেকেই তিনি একই সঙ্গে দলকে নতুনভাবে গুছিয়ে তোলা এবং সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নিজের স্বকীয় অবস্থান তৈরি এবং ভবিষ্যতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণে নিজেকে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করেন। আমি যদ্দুর জানি পুরো আশির দশক এবং নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধ জুড়ে তিনি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, পলিটিক্যাল ইকোনমি, দারিদ্র্য বিমোচনের উপায়, শিল্পায়নের সমস্যা, কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষার বিস্তার, নারীর অধস্তন অবস্থা অবসানের উপায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ এবং সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়ন-দর্শন নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা ও জানা-বোঝার চেষ্টা করেছেন। অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা। এক কথায় দৈনন্দিন লড়াই-সংগ্রাম, সাংগঠনিক কাজের মধ্যেও তিনি খবধৎহরহম চৎড়পবংং অব্যাহত রেখেছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে অধীত বিদ্যার সম্মিলন ঘটাতে চেষ্টা করেছেন।

দেশ ও জনগণের কল্যাণ চিন্তা থেকে উৎসারিত গভীর জ্ঞানস্পৃহা, বিষয়ের গভীরে যাওয়ার অনুসন্ধিৎসা, মনন ও সৃজনীশলতা, স্মৃতিশক্তি এবং ডিটেইলে যাওয়ার অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায় প্রভৃতির ভেতর দিয়ে শেখ হাসিনা অর্জন করেন আধুনিক রাষ্ট্রনায়কোচিত গুণাবলি। প্রচণ্ড বৈরি পরিবেশেও তাঁর এই জ্ঞানচর্চা আজো অব্যাহত। তাঁর এই সাধনা ও প্রস্তুতি যে ব্যর্থ হয়নি তা প্রমাণিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ পরিচালনায় তাঁর ব্যক্তিগত ও দলগত অসাধারণ সাফল্যে।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শেষে পর দলীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর তাকে অভিনব সব পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ১৭ মে। আর স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান নিহত হন ৩০ মে। রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হয় চরম উত্তেজনা, অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতা। বস্তুত দেশে ফিরে শেখ হাসিনা স্থিরভাবে বসারও সময় পাননি। আরেকটি সামরিক শাসন অনিবার্য হলেও দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। অসাংবিধানিক ধারা ঠেকাতে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। বিএনপির প্রার্থী বিচারপতি সাত্তারের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা দলের নেতা ড. কামাল হোসেনকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষে তিনি ব্যাপক গণ-সংযোগ করেন। জনগণের সঙ্গে তার সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাঁকে পেয়ে দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকরাও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

নির্বাচনের ফলাফল কী হতে পারে তা তার জানাই ছিল। ৬৫% ভোটে বিচারপতি সাত্তারকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। পুরো নির্বাচন ব্যবস্থাকেই যে বিএনপি এবং সামরিক জান্তারা একটা প্রহসনে পরিণত করেছে, পুনরায় এ অভিজ্ঞতাই দেশবাসী অর্জন করে।

কিন্তু তথাকথিত 'নির্বাচিত' সরকারের আয়ুষ্কাল বেশিদিন টেকেনি। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। দেশে আবার প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন জারি করা হয়। সংবিধান স্থগিত, রাজনৈতিক দল ও তৎপরতা নিষিদ্ধ হয়। সৃষ্টি হয় এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা।

কিন্তু এই অবস্থা মেনে নেওয়া হয়নি। অচিরেই শেখ হাসিনা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে এই প্রথম তিনি সকল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তিকে একমঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করেন। সমশত্রুর বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোকেও যুগপৎ আন্দোলনের ধারায় সামিল করেন। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত করেন নতুন মাত্রা-নতুন শৈলী। ফ্যাসিস্ট সামরিক জান্তা অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়ে আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চায়। গ্রেফতার ও অন্তরীণ করা হয় শেখ হাসিনাকে। গ্রেফতার হন অসংখ্য নেতা-কর্মী।

এক পর্যায়ে পিছু হটতে বাধ্য হয় সামরিক জান্তা। সামরিক শাসন অবসানের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে সংসদ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয় জেনারেল এরশাদ। কিন্তু জান্তার শাসন প্রলম্বিত করার কৌশল হিসেবে খালেদা জিয়া এরশাদের সঙ্গে গোপন সমঝোতার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ান। জনগণ '৮৬-এর নির্বাচনে বিপুলভাবে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করে। কিন্তু আকস্মিকভাবে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা বন্ধ রেখে মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে সামরিক জান্তা পুরো নির্বাচনী ফলাফলকে পাল্টে দেয়। ছিনিয়ে নেয় আওয়ামী লীগের বিজয়। প্রতিবাদ জানালেও তাৎক্ষণিকভাবে সংসদ থেকে পদত্যাগ না করে সংসদের ভেতরে-বাইরে সংগ্রামের কৌশল গ্রহণ করেন শেখ হাসিনা। সংসদে বিরোধীদলের নেতা হিসেবে নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তিনি। তীব্রতর করে তোলেন স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলন। এরশাদের পদত্যাগের দাবি এবং 'আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব' স্লোগান উত্থাপন করেন। ভীত-সন্ত্রস্ত স্বৈরশাসক এরশাদ ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর সংসদ ভেঙে দেন এবং ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ আওয়ামী লীগসহ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো বর্জন করলেও আবার একটি প্রহসনমূলক নির্বাচন করে অবৈধ ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার মরিয়া চেষ্টা করেন।

কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বৈরশাসন বিরোধী ধারাবাহিক আন্দোলন ক্রমেই জেল-জুলুম, হত্যা-সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে হয়ে ওঠে দুর্দমনীয়। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়কালে দফায় দফায় জরুরি অবস্থা জারি, নূর হোসেন, সেলিম, তাজুল, ফাত্তাহ এবং ডা. মিলনসহ অগণিত শহিদের আত্মদান, নূর হোসেন স্কোয়ারের কাছে শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলিবর্ষণ, জেল-জুলুম, অত্যাচার, দল ভাঙিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের কেনা-বেচা, বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা প্রভৃতি কোনো কিছুই আন্দোলনের জোয়ার ঠেকাতে পারেনি। অবশেষে ১৯৯০ সালে অপ্রতিরোধ্য গণঅভ্যুত্থানের মুখে স্বৈরশাসনের অবসান হয়। তিন জোটের রূপরেখার ভিত্তিতে জেনারেল এরশাদ বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

স্বৈরশাসন-বিরোধী আন্দোলনের রূপকার ও অকুতোভয় সংগ্রামী নেত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের মানুষ 'গণতন্ত্রের মানসকন্যা' অভিধায় অভিষিক্ত করে।

স্বৈরশাসনের উত্তরাধিকার : তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য ছিল স্বৈরশাসনের অবসান, সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জনগণের ভাত-কাপড়-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা-কর্মসংস্থান তথা জীবন ও জীবিকার সমস্যা সমাধান। '৯১-এর নির্বাচনে জামাতের সঙ্গে গোপন আঁতাতের ভিত্তিতে বিএনপি জয়লাভ করে এবং জামাতের সমর্থনে সরকার গঠন করে। খালেদা জিয়া তিন জোটের রূপরেখার সঙ্গে বেঈমানি করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে নিজে রাষ্ট্রপতি হতে চান। গণতন্ত্রের মানসকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা খালেদা জিয়ার এই দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেন। তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টে সংসদীয় ব্যবস্থা সংবলিত সংবিধান সংশোধনের বিল উত্থাপন করে। অবশেষে প্রবল জনমতের চাপে দ্বাদশ সংবিধান সংশোধনী বিল পাস হয়। প্রকৃতপক্ষে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জননেত্রী শেখ হাসিনার এই অবিস্মরণীয় অবদান জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় হলো দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা এবং একটি নির্বাচিত সরকারের ধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও ক্যান্টনমেন্টে সৃষ্ট বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল– বিএনপি এবং 'বেগম জেনারেল' খালেদা জিয়া অতীতের স্বৈরশাসনের ধারাই অব্যাহত রাখেন। সংসদকে পরিণত করা হয় ঠুঁটো জগন্নাথে। সামরিক ফরমানের মতোই রাষ্ট্র পরিচালিত হয় রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে। অচিরেই নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করা হয়। হরণ করা হয় জনগণের ভোটাধিকার। ঢাকা ও মাগুরা উপ-নির্বাচনের ভেতর দিয়ে প্রমাণিত হয়ে যায় বিএনপি'র অধীনে কোনো অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও অব্যাহত থাকে লুটপাটের ধারা। দেশ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যায়।

আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ দেশবাসীকে এই নব্য স্বৈরশাসনের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য আবারো জননেত্রী শেখ হাসিনাকেই অবতীর্ণ হতে হয় নতুন সংগ্রামে। তিনি 'ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা' এবং 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের' ঈড়হপবঢ়ঃ তুলে ধরেন। 'শিশু ও পাগল' ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয় বলে উপহাস করে খালেদা জিয়া এই দাবি মানতে অস্বীকৃতি জানান। আওয়ামী লীগসহ বিরোধীদলগুলোর প্রবল প্রতিরোধ উপেক্ষা করে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬-এর ১৫ ফেব্রুয়ারির ভোটার ও দলবিহীন নির্বাচন। কিন্তু ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার এই কলঙ্কজনক অধ্যায় সৃষ্টি করেও শেষ রক্ষা করতে পারেন না খালেদা জিয়া। বরং এই নির্বাচন শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের অভিযোগকেই সুপ্রমাণিত করে। গর্জে ওঠে বাংলাদেশ। ঘটে গণবিস্ফোরণ। শেখ হাসিনা অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। অচল হয়ে যায় বাংলাদেশ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় খালেদা সরকার।

নির্বাচনে জয়লাভ ও সরকার প্রতিষ্ঠা

জাতীয় ইতিহাসে সংযোজিত হয় এক নতুন অধ্যায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত হয় অবাধ, নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করে। দেশবাসীর আস্থা ও ভালোবাসায় অভিষিক্ত বঙ্গবন্ধু-কন্যা

জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘ একুশ বছর পর আবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসীন করেন।

আমরা বলতে পারি, ১৯৮১ সালের ১৭ মে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৯৬ সালের ১২ জুন পর্যন্ত শেখ হাসিনার বড়মাপের ৩টি সাফল্য হলো– ১. দেশকে স্বৈরশাসনের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করা; ২. দীর্ঘ একুশ বছর পর আওয়ামী লীগকে পুনরায় রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা এবং ৩. আওয়ামী লীগকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

শেষোক্ত বিষয়ে স্মর্তব্য যে, শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আগেই জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে দলের একাংশ দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে একই নামে স্বতন্ত্র দল গঠন করেছিলেন। দ্বিতীয়ত যারা উদ্যোগী হয়ে শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনেছিলেন তাঁদেরও অনেকে তাঁকে ছেড়ে গিয়েছিলেন, দলত্যাগ করে বাকশাল ও অন্য নামে স্বতন্ত্র দল গঠন করেছিলেন। স্বভাবতই এই সব অনভিপ্রেত ভাঙনের চেষ্টা সাময়িকভাবে হলেও দলকে দুর্বল করেছিল। কিন্তু নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে প্রায় সবাই আবার ঘরে ফিরে এসেছেন। 'ঐক্যের প্রতীক' হিসেবে শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী সবাইকে এক পতাকার নিচে সংঘবদ্ধ করেছেন। পরাভূত হয়েছে ভাঙনের অপদেবতা; নস্যাৎ হয়েছে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা। আর দলের এই ঐক্য ও সংহতিও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিজয় লাভের পথ সুগম করেছে।

রাষ্ট্র পরিচালনায় শেখ হাসিনার সাফল্য

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলতে গেলে সাতকাহন কথা হয়ে যাবে। সবই তো আপনাদের জানা। আমি ব্যাখ্যায় না গিয়ে এ প্রসঙ্গে কেবল প্রধান কয়েকটি দিকের উলে-খ করব।

অনেক দল-নিরপেক্ষ অর্থনীতিবিদ-রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও গবেষক ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সাল সময়কালকে অর্থাৎ শেখ হাসিনার শাসনামলকে বাংলাদেশের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় বলে অভিহিত করেছেন। আমি একে বলব মুক্তি ও স্বাধীনতার আলোয় উদ্ভাসিত আমাদের কালের অবারিত সম্ভাবনার সোনালি সময়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ ও অর্জিত সাফল্য

১. দেশ পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

২. জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনেন।

৩. গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং সংসদীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ (সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে মন্ত্রীর বদলে সদস্যদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান নিয়োগ, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু, কোনো অধ্যাদেশ জারি না করা এবং ইনস্টিটিউট অব পার্লামেন্টারি স্ট্যাডিজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি)।

৪. কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার, জেলহত্যা বিচারের প্রক্রিয়া শুরু; ইতিহাস বিকৃতিরোধ এবং বঙ্গবন্ধুকে স্বমহিমায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

৫. ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদন করে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা আদায় করেন। প্রণয়ন করেন দীর্ঘমেয়াদী পানিনীতি।

৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পাদন ও দেশের এক দশমাংশ জুড়ে রক্তপাত ও হানাহানি বন্ধ করেন। ভারত থেকে ৬৫ হাজার চাকমা শরণার্থীকে স্বদেশে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসিত করেন।

৭. চারস্তর বিশিষ্ট শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার আইন প্রণয়ন করেন।

৮. সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেন। এ সময়েই প্রথম দেশে একাধিক স্যাটেলাইট ও টেরিস্ট্রিয়াল টিভি চ্যানেল চালু করা হয়।

৯. প্রশাসনের দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠন করেন গণপ্রশাসন সংস্কার কমিশন।

১০. ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করেন।

১১. নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করেন বহুমুখী পদক্ষেপ। এর মধ্যে বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ প্রগতিশীল নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা, পিতার নামের সঙ্গে মায়ের নাম উলে-খ বাধ্যতামূলক করা, স্থানীয় সরকারের সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন প্রথা চালু, হাইকোর্টের বিচারপতি এবং সচিব, যুগ্ম সচিব, জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপারসহ সরকারি উচ্চপদে মহিলাদের নিয়োগ, সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীতে মেয়েদের নিয়োগ, নারী শিক্ষার প্রসার, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা ভাতা প্রচলন ইত্যাদি।

১২. প্রতিরক্ষা বাহিনীর সুযোগ-সুবিধা, যুদ্ধোপকরণ ও সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধি করেন এবং গ্রহণ করেন আধুনিকীকরণের মাধ্যমে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলার পদক্ষেপ।

১৩. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের' মর্যাদা লাভ করে।

১৪. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদাপূর্ণ ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়। অর্থনৈতিক-কূটনীতির মাধ্যমে উন্মোচিত হয় আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত। তিনি বিমসটেক ও ডি-৮ গ্রুপ গঠনে পালন করেন উদ্যোগী ভূমিকা। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য পদ লাভ করার বিরল গৌরব অর্জন করে। তাঁর উদ্যোগেই গঠিত হয় এশিয়ান পার্লামেন্টারিয়ান এসোসিয়েসন ফর পিস। তিনি ছিলেন এর প্রথম চেয়ারপার্সন।

আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উলে-খযোগ্য সাফল্য

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উলি-খিত সাফল্যের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে-সব চমকপ্রদ যুগান্তকারী সাফল্য অর্জিত হয় তার কয়েকটি হলো–

১. ৪০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণ করে দেশকে এই প্রথম খাদ্যে আত্মনির্ভরশীল এবং উদ্বৃত্ত খাদ্যের দেশে পরিণত করেন শেখ হাসিনা। এই বিরল সাফল্যের জন্য বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ঋঅঙ তাকে সেরেস পদকে ভূষিত করে। এ সাফল্যের পেছনে রয়েছে সার, সেচ, বিদ্যুৎসহ কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান, সারের সুষ্ঠু বিতরণ নিশ্চিতকরণ,

বিনা জামানতে ভূমিহীন কৃষক ও বর্গাচাষিসহ কৃষকদের পর্যাপ্ত ঋণ সহায়তা প্রদান, সর্বোপরি সৎ-দক্ষ ব্যবস্থাপনা।

২. দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেন শেখ হাসিনা। ক্ষমতায় আসার অনেক আগে থেকেই শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন কৌশল নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৯৩ সালে এমনি এক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে, "দারিদ্র্য দূরীকরণ : কিছু চিন্তা-ভাবনা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, "দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা এবং সে কারণেই এ দেশের জন্য যে কোনো উন্নয়ন-কৌশলের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে দারিদ্র্য দূরীকরণকে চিহ্নিত করতে হবে। ... চরম দারিদ্র্যের ভেতরে দেশের অধিকাংশ মানুষকে যদি বছরের পর বছর ধরে বাস করতে হয়, তবে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে বাধ্য। তৃতীয়ত আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা অনেকখানি নির্ভর করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নতির ওপর।" এই প্রবন্ধ ছাড়াও আরো একাধিক প্রবন্ধে/গ্রন্থে দারিদ্র্য বিমোচনে তার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, করণীয় ও পরিকল্পনা বিধৃত আছে। বস্তুত সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণের পর দারিদ্র্য নিরসন এবং দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে তিনি নানা উদ্ভাবনী প্রকল্প ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এসবের মধ্যে রয়েছে–

ক. শিক্ষার প্রসার, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন। তার উদ্যোগে একটি গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণীত হয়। দেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

সাক্ষরতার হার ৪৪ শতাংশ থেকে ৬৫ শতাংশে উন্নীত হয়।

খ. স্বাস্থ্য খাতে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে প্রত্যাশিত গড় আয়ু ৫৮.৭ বছর থেকে বেড়ে ২০০০ সালে ৬৩ বছরে উন্নীত হয়।

গ. দরিদ্রদের জন্য গড়ে তোলা হয় অভিনব নিরাপত্তা বেষ্টনি। বয়স্ক ভাতা, দুস্থ মহিলা ভাতা, আশ্রয়ন, গৃহায়ণ, আবাসন, ঘরে ফেরা কর্মসূচি, একটি বাড়ি একটি খামার, কর্মসংস্থান ব্যাংক, ক্ষুদ্র ঋণ, আদর্শ গ্রাম কর্মসূচি প্রভৃতি ছাড়াও দরিদ্রদের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ব্যাপক হারে ভিজিএফ কার্ড, কাজের বিনিময়ে কর্মসূচি, জিআর, টিআর প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ফলে আওয়ামী লীগ আমলে গড়ে ১.৫ শতাংশ হারে দারিদ্র্য হ্রাস পায়। মানব দারিদ্র্য সূচক পূর্বতন বিএনপি-আমলের ৪২ শতাংশ থেকে শেখ হাসিনার আমলে ৩৪ শতাংশে নেমে আসে। পক্ষান্তরে মানব উন্নয়ন সূচক ১৯৯৬-৯৭-এর ৪২.৬ শতাংশ থেকে ১৯৯৮-৯৯ সময় পরিসরে ৪৮.৫ শতাংশে উন্নীত হয়।

দুঃখজনক হলেও সত্য, দারিদ্র্য হ্রাসের এই হার বর্তমান দুর্বৃত্ত লুটেরা জামাত জোট সরকারের আমলে আবার থমকে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য ও নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া আবার জোরদার হয়েছে। আওয়ামী লীগ আমলে যা হয়নি, মঙ্গায়-দুর্ভিক্ষে অনাহারে আবার মানুষ মারা যাচ্ছে।

ঘ. শেখ হাসিনা সরকারের একটি বড় সাফল্য তার শাসনামলে নিত্য-প্রয়োজনীয়

জিনিসপত্রের দাম বাড়তে না দিয়ে স্থিতিশীল রাখতে পারা। অথচ জোট সরকারের গত সাড়ে চার বছরের দুঃশাসন ও মূল্য সন্ত্রাসীদের লুটপাটের ফলে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বেড়েছে প্রতিটি জিনিসের দাম। মূল্যসন্ত্রাসী সিন্ডিকেট একমাত্র খাদ্যমূল্য বাড়িয়ে গত সাড়ে চার বছরে ৭৭ হাজার কোটি টাকা লুটে নিয়েছে।

৩. ১৯৯৮ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থাপন করেন অনুকরণীয় দক্ষতা ও সাফল্যের বিরল দৃষ্টান্ত। ২ কোটি মানুষ মারা যাবে বলে যে প্রচারণা চালানো ও আশঙ্কা করা হয়েছিল তা মিথ্যা প্রমাণিত করেন। খাদ্যাভাবে একজন মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হয়নি।

৪. শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ প্রায় ৬.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন। পক্ষান্তরে মুদ্রাস্ফীতি কমে দাঁড়িয়েছিল ১.৫৯ শতাংশে। জনগণের মাথা প্রতি গড় আয় ২৮০ ডলার থেকে ৩৮৬ ডলারে উন্নীত হয়েছিল। ফলে বেড়েছিল ক্রয়ক্ষমতা।

৫. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে শেখ হাসিনার সাফল্যকে স্পর্শ করা দূরে থাক, জোট সরকার তা ধরেও রাখতে পারেনি। জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব নেন তখন দেশে কার্যকর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র ১৬০০ মেগাওয়াট। পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন তিনি ১৬০০ থেকে ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেন। এটা একটা বিস্ময়কর সাফল্য মনে হতে পারে। কেননা সাড়ে চার বছরে জোট সরকার কার্যত এক মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে পারেনি। অথচ বিদ্যুতের দাবি জানানোয় এক কানসাটেই ২০ জন মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের জন্য শেখ হাসিনার নির্দেশে ২৮টি নতুন কূপ খনন এবং প্রথম চার বছরে ১৩টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন প্রায় ১২ লাখ এমএমসিএফ-এ উন্নীত হয়। নানা স্বার্থ সংশি-ষ্ট আন্তর্জাতিক শক্তিধর গোষ্ঠীর চাপ সত্ত্বেও তিনি জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে গ্যাস রপ্তানি করতে রাজী হননি।

৬. শেখ হাসিনার আরো একটি বড় সাফল্য হচ্ছে, বাংলাদেশে একটি শিল্প সভ্যতার ভিত্তি রচনা। এ লক্ষ্যে তিনি একটি নির্ভরযোগ্য ভৌত-অবকাঠামো গড়ে তোলার কাজে হাত দেন। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির কথা তো আগেই বলেছি। যোগাযোগ ক্ষেত্রেও অর্জিত হয়েছে বিপুল সাফল্য। বঙ্গবন্ধু সেতুতে রেললাইন সংযোগ করে নির্ধারিত সময়ের আগে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। পদ্মা (পাকশী), মেঘনা (ভৈরব), রূপসা (খুলনা)সহ দেশের বড় বড় নদীতে সেতু নির্মাণের কাজ তাঁর আমলেই শুরু হয়। তাঁর আমলে ১৫,১২৮ কিলোমিটার নতুন পাকা সড়ক এবং প্রায় ৩৬ হাজার কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা এবং ১৯ হাজার ছোট-বড় ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। জোট সরকার গত সাড়ে চার বছরে একটিও নতুন ব্রিজ, সড়ক নির্মাণ করেনি। বরং আওয়ামী লীগ আমলের নির্মাণাধীন ব্রিজ, সড়ক, ভবন ও অন্যান্য স্থাপনার ফিতা উদ্বোধন করে কৃতিত্ব হাইজ্যাক করে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করছে।

৭. টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রেও শেখ হাসিনা বিএনপি আমলের মনোপলি ও স্থবিরতা ভেঙে দেন। ফলে লাখ টাকার মোবাইল ৫-৭ হাজার টাকায় নেমে আসে এবং মোবাইল ফোনের সংখ্যা ২০০০ থেকে শেখ হাসিনার ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে ৭ লক্ষে উন্নীত হয়। পক্ষান্তরে ল্যান্ড ফোনের সংখ্যা তিনগুণ বেড়ে দাঁড়ায়

৬,৬৬,৯২০টিতে। দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলকে টেলিযোগাযোগের আওতায় এনে প্রকৃতই বাংলাদেশকে গে-াবাল ভিলেজের অংশে রূপান্তরিত করেন তিনি।

৮. জননেত্রী শেখ হাসিনা ব্যক্তিগতভাবে কম্পিউটার ব্যবহারে অভ্যস্ত। তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় তিনি এই সেক্টরের সম্ভাবনা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন। অদূরদর্শী, গো-মূর্খ খালেদা জিয়া বিনা পয়সায় পেয়েও সেবার আন্তঃমহাদেশীয় ফাইবার অপটিকস সংযোগ থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করেছিল। ফলে দেশ তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ১২ বছর পিছিয়ে যায়। জননেত্রী শেখ হাসিনা আইটি সেক্টরের অপরিসীম গুরুত্ব ও সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে কম্পিউটার ও সফটওয়্যার আমদানির ওপর শুল্ক প্রত্যাহার করে নেন এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে বিশেষ তহবিল বরাদ্দ করেন। অবারিত করে দেন তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প বিকাশের পথ। তিনি সরকারি দপ্তরের কর্মকাণ্ডকে কম্পিউটারাইজড করার প্রকল্প নেন। জানা গেছে, জোট সরকারের আমলে সে প্রকল্প পরিত্যক্ত হয়েছে।

৯. অবকাঠামো উন্নয়ন, ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, দুর্নীতি ও লালফিতার দৌরাত্মে রাশ টেনে ধরা, আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি, সরকার পরিচালনায় দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা সর্বোপরি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হওয়ার ফলে শেখ হাসিনার আমলে জিডিপির জাতীয় সঞ্চয় ও দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ছোট-বড় এক লক্ষাধিক নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়। অমিত সম্ভাবনার দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

১০. শেখ হাসিনার প্রেরণাদায়ক নেতৃত্বে ও উদ্যোগী ভূমিকার জন্য শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রেও অর্জিত হয় অসামান্য সাফল্য। বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটের মর্যাদা লাভ করে। তরুণ-যুবকদের মধ্য ফিরে আসে আত্মশক্তিতে আস্থা। মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে পান শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা। প্রায় সকল ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় সৃজনশীলতার মুক্তধারা।

এ কথা ঠিক, রাষ্ট্র পরিচালনা একটা যৌথ কর্ম। সরকার প্রধান হিসেবে তিনিই ছিলেন এই যৌথ কর্মসম্পাদনের মূল উদ্যোক্তা, সমন্বয়কারী এবং পরিচালক। প্রায় প্রতিটি কাজের পেছনে ছিল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান, দিক-নির্দেশনা, প্রেরণা, সহায়তা এবং মনিটরিং। নিজেদের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় ও সমঝোতা গড়ে তুলতে পারাও তাঁর ও তার সরকারের সাফল্যের অন্যতম কারণ। আর এজন্যই দেশবাসী আওয়ামী লীগ সরকারের সাফল্যকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সাফল্য হিসেবেই বিবেচনা করে।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

রাষ্ট্র পরিচালনায় তার এই দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং সাফল্যের জন্য কেবল দেশবাসী নয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তিনি অর্জন করেন এক অভূতপূর্ব মর্যাদার আসন। ঋঅঙ-এর সেরেস পদক ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে অনন্য ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ ইউনেস্কো তাকে হুফে বয়েনি শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। ২০০০ সালে তিনি অর্জন করেন এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মর্যাদা। এছাড়া তিনি নরওয়ের 'গান্ধী ফাউন্ডেশনের এম.কে. গান্ধী পদক', যুক্তরাষ্ট্রের 'পার্ল এস বাক পদক', 'মাদার তেরেসা পদক', 'নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস স্মৃতি পদক', 'লায়ন্স ক্লাব আন্তর্জাতিক অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক সম্মাননা পদক', '১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালে লায়ন্স ক্লাব আন্তর্জাতিক অ্যাসোসিয়েশন রাষ্ট্রপ্রধান পদক' এবং 'রোটারি

ইন্টারন্যাশনালের পল হ্যারিস ফেলোশিপ' লাভ করেন। গণতন্ত্র, উন্নয়ন, মানবাধিকার, শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং সৃজনশীল লেখনীর জন্য বিশ্বের প্রায় ডজনখানেক বিশ্ববিদ্যালয় শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করে।

কেবল ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায়ই নয় আশি ও নব্বইয়ের দশকে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের পর জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে শেখ হাসিনা সম্মানিত অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক এবং আলোচক হিসেবে যোগদান করেন। এসবের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের সীমান্ত পেরিয়ে তার খ্যাতি ও মর্যাদা আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সারিতে তার গর্বিত অবস্থান।

সাহিত্য-কর্ম

রাজনীতি ও রাষ্ট্রকর্মের শত ব্যস্ততার মধ্যেও শেখ হাসিনা রাজনৈতিক সাহিত্য রচনায় নিজের একটি স্বতন্ত্র আসন করে নিয়েছেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বেশ কিছু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সম্পাদনা করেছেন। এর মধ্যে উলে-খযোগ্য হলো 'বিপন্ন গণতন্ত্র লাঞ্ছিত মানবতা', 'সহেনা মানবতার অবমাননা', 'ওরা টোকাই কেন', 'বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম', 'সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র', 'দারিদ্র্য দূরীকরণ : কিছু চিন্তা-ভাবনা', 'বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন', 'আমার স্বপ্ন, আমার সংগ্রাম' প্রভৃতি। তাঁর রচনাসমূহে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, বিশে-ষণ এবং একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের চিন্তাধারা। গভীর ও জটিল বিষয়কে অত্যন্ত সহজ-সরল জনবোধ্য ভাষায় প্রকাশের অনবদ্য প্রসাদগুণ রয়েছে তাঁর লেখায়। এজন্য যে কোনো স্তরের পাঠককে তা আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।

জাতির জনকের স্মৃতি রক্ষা

সরকারে থাকাকালে তিনি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ ও সেখানে একটি স্মৃতি রক্ষা কমপে-ক্স নির্মাণ করেন। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ বাঙালি জাতির এই মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে টুঙ্গিপাড়ায় সমবেত হয়।

দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তিনি এবং শেখ রেহানা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে জাতির জনকের স্মৃতিকে চির ভাস্বর করার লক্ষ্যে গড়ে তুলেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনকে ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর। এই জাদুঘর এখন বাঙালির তীর্থ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সম্প্রসারিত হচ্ছে জাদুঘর। বিস্তৃত হচ্ছে ট্রাস্টের জনহিতকর ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড। দেশের জন্য তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে গড়া এই প্রতিষ্ঠানগুলো অনাগতকাল ধরে বাঙালি জাতিকে মহৎ আত্মদানে অনুপ্রাণিত এবং মুক্তি ও স্বাধীনতার চেতনায় আলোকিত করবে।

সর্বমঙ্গলা

রাজনীতি ও রাষ্ট্রকর্মের বাইরেও অন্য এক শেখ হাসিনা আছেন। যিনি বাঙালি ঘরানার চিরচেনা আদর্শ জায়া, জননী, ভগিনী। পঁচিশ বছর আগে কিশোর বয়সী পুত্র-কন্যাকে স্নেহ ও পরিচর্যা বঞ্চিত করে দেশের ডাকে চলে এসেছিলেন। পৃথিবীর যে-কোনো মায়ের পক্ষে এ এক কঠিন পরীক্ষা। দেশব্রতে তাঁর এ আত্মত্যাগও যেন এক তপশ্চর্যা। এ তপস্যায়ও

তিনি সিদ্ধি অর্জন করেছেন। দূরে থাকলেও ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলেছেন। সন্তানদের জন্য তিনি মা হিসেবে গর্ব করতে পারেন। একমাত্র বোন ও তার সন্তানদের অভিভাবক, বন্ধু, গাইড হিসেবেও তিনি তার দায়িত্বের কথা বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হননি। বস্তুত সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, দানে-ধ্যানে-কর্তব্যে, স্নেহে-মমতায়, শাসনে-সোহাগে, সেবায়-যত্নে বৃহত্তর আওয়ামী পরিবারেও তিনি এক সর্বমঙ্গলা।

তাঁর এ আদর্শ অনুকরণীয় বলেই এই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা।

আজ নির্দ্বিধায় বলা যায় শেখ হাসিনা একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, সংগঠক ও সৃজনশীল লেখক। তাঁর সাফল্যের পেছনে রয়েছে তার মহান পিতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর জীবনের অমলিন শিক্ষা, দেশ ও জনগণের প্রতি গভীর অনুরাগ, সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং অসাধারণ আত্মবিশ্বাস। তার মধ্যে গভীর ধর্মানুরাগের পাশাপাশি অবিমিশ্রভাবে রয়েছে অসাম্প্রদায়িক উদার মানবিক মূল্যবোধ, স্বদেশানুরাগ ও বিশ্বজনীনতা, মুক্তচিন্তা এবং বিজ্ঞান-মনস্কতা।

সত্য বটে অতি মানবী নন তিনি। নন তিনি সর্বগুণে গুণান্বিতা। রক্ত-মাংসের মানুষ। চলারপথে তারও ভুল-ত্রুটি সীমাবদ্ধতা থাকা স্বাভাবিক। তবে স্বাভাবিক বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু এক-সহজ সারল্যে ভরা চরিত্র মাধুর্য এবং মানবিক আবেগে ভরা খোলামেলা বৈশিষ্ট্য তাকে জনগণের একান্ত আপনার জনে পরিণত করেছে। তিনি হয়ে উঠেছেন এ দেশের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সকল দল ও মতের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

বিএনপি-জামাত জোটের হিংস্র রক্তাক্ত দুঃশাসনের গত সাড়ে চার বছরে এই উপলব্ধি আরো গভীরতর হয়েছে। জোট সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, হত্যা, সন্ত্রাস এবং রাষ্ট্রীয় দমন নির্যাতনের শতমুখী আক্রমণের মুখে বুক আগলে তিনি রক্ষা করেছেন আওয়ামী লীগের লাখ লাখ কর্মী-সমর্থককে। দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছেন সেক্যুলার গণতান্ত্রিক শক্তিকে। ফলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে গণতান্ত্রিক শক্তি। সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন ও দুঃশাসনের অবসানের লক্ষ্যে তাঁর নেতৃত্বে চূড়ান্ত আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকলে বাংলাদেশের চেহারা এখন কেমন হতো

অনেকেই প্রশ্ন করেন শেখ হাসিনা যদি গত সাড়ে চার বছর দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকতেন তাহলে জনগণের অবস্থা ও উন্নয়ন দৌড়ে বাংলাদেশ কোথায় থাকত? এ প্রসঙ্গে চোখ বুঁজেই বলা যায়, গত সাড়ে চার বছর শেখ হাসিনার পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের শাসনামলের মতোই খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল থাকত। দেশের উন্নতির প্রবৃদ্ধি অনায়াসে ৮ শতাংশ স্পর্শ করত। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট থাকত না। তিনি যেসব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণাধীন রেখে এসেছিলেন তা যদি নির্মিত হতো, তাহলে ২০০৫ সালের মধ্যেই দেশের বিদ্যুৎ উপাদন ৬,৭৭২ মেগাওয়াটে এবং আগামী ২০০৬-০৭ সালের মধ্যে ৮,২৩৮ মেগাওয়াটে উন্নীত হতো। দেশের প্রায় সবগুলো গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে যেত। বিদ্যুৎ সংকট বলে কিছু থাকত না। সাক্ষরতার হার অন্তত ৮৫ শতাংশে উন্নীত হতো। ২ শতাংশ হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেত। মানব দারিদ্র্যসূচক ৩৪ থেকে অন্তত ২৫ শতাংশে নেমে আসত। স্বল্পোন্নত দেশের স্তর থেকে বাংলাদেশ লাভ করত উন্নতিশীল দেশের মর্যাদা। জনগণের মাথাপিছু আয় অন্তত দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেত। বাংলাদেশ চাল রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হতো। আইটি খাতে সফটওয়্যার রপ্তানি ও শিল্প ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় দ্রুত বর্ধনশীল দেশে পরিণত হতো। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ অকার্যকর ও শ্রেষ্ঠ দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্র হিসেবে কলঙ্কিত হতো না। এই তালিকা আরো দীর্ঘ করা যায়। তবে আজ তা করবো না।

আসলে দুর্ভাগ্য বাঙালি জাতির, অমিত সম্ভাবনার দেশ হয়েও বারবার তাকে ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হচ্ছে। দারিদ্র্য, পশ্চাৎপদতা, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন ও স্বৈরশাসনের ফাঁদ থেকে বেরুতে পারছে না।

মৃত্যুঞ্জয়ী-জীবনজয়ী

যে তিনি নিজেকে 'বঙ্গবন্ধু কন্যা'– এই একটি মাত্র পরিচয়ে গর্বিত এবং সন্তুষ্ট মনে করেন, গত পঁচিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম ও সাধনার ভেতর দিয়ে তিনি তাঁর ওই পরিচয়কে অতিক্রম করে অর্জন করেছেন নিজস্ব আইডেন্টিটি। এখন তার নিজের পরিচয়েই তিনি বাঙালি জাতির অবিসংবাদী নেত্রী। বাঙালি জাতির মুক্তিপথের দিশারী। সেক্যুলার গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের প্রতীক। শেষ ভরসাস্থল।

আর সম্ভবত এ কারণেই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকে গত পঁচিশ বছরব্যাপী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি, পঁচাত্তরের খুনি, সামরিক স্বৈরশাসক, বিএনপি-জামাত চক্র, উগ্রসাম্প্রদায়িক জঙ্গিগোষ্ঠী ও দেশি-বিদেশী ফ্যাসিস্টচক্রের টার্গেট হয়ে আছেন। গত পঁচিশ বছরে অন্তত ১৯ বার শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ ২০০৪ সালের ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার কথা আমরা সবাই জানি। বিএনপি-জামাতের ঘাতকচক্র মনে করে শেখ হাসিনা তাদের পথের কাঁটা। তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারলেই তারা তাদের দুঃশাসনকে নিষ্কণ্টক ও পাকাপোক্ত করতে পারবে; কিন্তু তাদের সেই দুরাশা পূরণ হয়নি। বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের ভালোবাসায় অভিষিক্ত শেখ হাসিনা প্রতিবারের মতো এবারো অলৌকিকভাবে প্রাণে রক্ষা পান। নিয়তির ইচ্ছায়ই যেন তিনি প্রতিবার মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে জীবনের দাবি মেটাতে শতগুণ সাহস ও শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন নতুন যুদ্ধে। এই যুদ্ধে জয়লাভ না করে তাঁর মৃত্যু নেই।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পঁচিশ বছর পূর্তির এই দিনে বাঙালি জাতির মুক্তি সাধনার সারথি জননেত্রী শেখ হাসিনার সাফল্য ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শতায়ু কামনা করছি। শেষ করছি একটি শব্দের ঈষৎ পরিবর্তন করে 'মহাত্মা গান্ধীকে' নিয়ে লেখা জীবনানন্দ দাসের কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্বৃত করে।

মানুষের প্রাণ থেকে পৃথিবীর মানুষের প্রতি
যেই আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফিরে আসে, 'শেখ হাসিনাকে'
আস্থা করা যায় ব'লে;
হয়তো-বা মানবের সমাজের শেষ পরিণতি গ-ানি নয়;
হয়তো-বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে, শান্তি আছে, মানুষের অগ্রসর আছে; ...